তারিখ 09 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

হায়াত হোসেন
অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক লেখালেখি, আলোচনা–সমালোচনা, এমনকি সংবাদ সম্মেলনও হয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও রিপোর্টটির উপর কোন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হয়নি। রিপোর্টটি কার্যকর করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিরও কোন পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, প্রায় এক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ অথবা অচল হয়ে আছে এবং উপাচার্য তাঁর পাহাড় চূড়ার বাসভবন থেকে কবে যে শেষ প্রশাসনিক ভবনে এসেছিলেন তা স্মরণ করা মুশকিল। সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পর্যদের সভা স্থগিত হয়ে আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় রসাতলে যাক বা না যাক সেদিকে উপাচার্য বা তার প্রতিপক্ষ দল কারো ভ্রুক্ষেপও নেই। ক্ষমতা না ছাড়ার ব্যাপারে উপাচার্য যেমন অনমনীয়, তেমনি তাঁকে ক্ষমতায় না রাখার ব্যাপারে তাঁর প্রতিপক্ষরাও বদ্ধপরিকর।

হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আন্তরিক কোন উদ্যোগ না নেয়া হয় তাহলে ইতিহাসের কাছে অবশ্যই আমরা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকব। এবং কাজটি যে খুব কঠিন নয় তাও ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। তবে এর জন্যে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, বিশেষ করে সরকারের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা। তবে আবশ্যিকভাবেই এই প্রচেষ্টার ভিত্তি হতে হবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট; তা না হলে বিচার বিভাগ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি আগেই বলেছি এ রিপোর্ট নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক বাকবিতন্ডা হয়েছে, এর বিরূপ সমালোচনায় অনেক লেখাও বেরিয়েছে তবে এসব লেখা বা সমালোচনা করার আগে ৩০৪ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ রিপোর্টটির কেউ আদ্যপান্ত পাঠ করেছেন কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তদুপরি পিআইডি বা প্রেস ইনফর্মেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সরবরাহকৃত রিপোর্টটির ফটোকপিগুলো এতো অস্পষ্ট ছিল যে তা থেকে পাঠোদ্ধার করা ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতএব এটা অনুমান করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রথমেই পিআইডি কর্তৃক রিপোর্টের যে অতি সংক্ষেপিত সারাংশটুকু পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন জন তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ শিক্ষকও তাই করেছেন।

এ ব্যাপারে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি (প্রাক্তন) বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গত ১৬ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, অনেকে না বুঝেই তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের সমালোচনা করছেন বা অপব্যাখ্যা করছেন। আর তার সাথে আমি যোগ করে বলতে চাই যে, অনেকে রিপোর্টটি না পড়েই বা আংশিক পড়ে তা করেছেন। আশা করি আমার এ লেখার মধ্যে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে এবং তাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ও তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে পাঠকদের বিভ্রান্তি অনেকাংশে কেটেযাবে।

এবার তাহলে দেখা যাক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষক বক্তৃতা, বিবৃতি ও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই রিপোর্টের প্রচন্ড সমালোচনা করেছেন, এমনকি মাননীয় বিচারপতির সততা ও নিরপেক্ষতার উপর কটাক্ষ করেছেন তারা কমিশনের নিকট কি বক্তব্য রেখেছেন। তারা হয়ত কোন সময় ভাবেননি যে এই রিপোর্টটি একদিন প্রকাশিত হবে, এমনকি পত্রিকান্তরে পিআইডি–র সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটি পড়ার পরও হয়তো তারা ধারণা করেননি যে, মূল রিপোর্টে তাদের বক্তব্য হুবহু এসে পড়েছে। ফলে মূল রিপোর্টে সন্নিবেশিত তাদের বক্তব্য আর তাদের পরবর্তী বক্তৃতা, বিবৃতি, সমালোচনা ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলে তাতে দেখা যাবে মারাত্মক রকমের অসঙ্গতি, অমিল ও স্ববিরোধিতা। এটা কি তদন্ত কমিশনের তথা মাননীয় বিচারপতির দোষ, না আমাদের শিক্ষক বন্ধুদের হিপোক্র্যাসি–– সে বিচারের ভার

২২ ডিসেম্বর '৯০–এর ঘটনার তাৎক্ষণিক কারণ

১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত একটি সহিংস ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের অপসারণের দাবী থেকেই এই বিবাদের সূত্রপাত। এখানে মনে রাখা দরকার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, চাকসু, আপসু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ছাত্র শিবির ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনসহ প্রায় সকল মহলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়ে এই কমিশন গঠন করা হয়। এদিকে ২২ ডিসেম্বরের ঐ ঘটনা সম্পর্কিত ভাবাবেগ ও পত্র–পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারের রেশ যখন কমে যেতে থাকে এবং বিষয়টি নিয়ে সবাই যখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে শুরু করে তখন ঘটনার প্রকৃত চেহারা ও বিভিন্ন মহলের ভূমিকা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসতে লাগলো। উপাচার্যের পদত্যাগ বা অপসারণের দাবীতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল; কিন্তু তখন ধর্মঘট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও এমন ঘটনাতো আর কোথাও ঘটেনি। একদল ধর্মঘট বা হরতালের ডাক দিলে আরেক দল তো কখনো বাধা দেয়নি। অন্যান্য জায়গার মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও এটা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল এবং আমরা শিক্ষকরাও কোন সময় জোর করে ক্লাস নিতে যাইনি। কিন্তু ২২ ডিসেম্বর হঠাৎ এই বাধাদানের প্রশ্ন কেন এলো? ১৯৮৭ সালে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষক সমিতি তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্মঘট আহবান করেছিল এবং তা তিন মাস ধরে চলেছিল। ছাত্র সংগঠনগুলোও আমাদের পক্ষে ছিল; কিন্তু প্রতিপক্ষ শিক্ষক গোষ্ঠী এবং ছাত্র শিবির পত্র–পত্রিকায় আমাদের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেও জোর খাটিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গার বা ক্লাস নেয়ার চেষ্টা করেনি যদিও ক্যাম্পাস তখনও শিবিরের দখলে ছিল। কিন্তু এখন যখন দক্ষিণপন্থীদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষক সমিতি ঠিক একইভাবে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দিনের পদত্যাগ দাবী করে লাগাতার ধর্মঘট আহবান করলো এবং ছাত্র শিবির তাদের সমর্থন জানালো তখন আমাদের বন্ধুরা এটাকে কেন প্রতিহত করতে গেলেন? একটু তলিয়ে দেখলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবীতে আহূত এই ধর্মঘটকে বানচাল করা উপাচার্য খুব জরুরী মনে করলেন; কিন্তু ঘটনাটি যে এভাবে বুমেরাং হয়ে তার নিজের ঘাড়ের উপর পড়বে তা তিনি হয়তো বুঝতে পারেননি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে বুঝতে লাগলেন এবং যাদের দিয়ে ঘটিয়েছেন তারাও। এ কারণেই এরপর তারা একটিবারও তদন্ত কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করা বা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবী জানাননি।

ফলে দেখা যাচ্ছে ২২ ডিসেম্বরের ঘটনার তাৎক্ষণিক কারণটি নির্ণয় করতে গিয়ে মাননীয় বিচারপতি যে বক্তব্য রেখেছেন তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার সামান্যতম অবকাশ নেই।

––(চলবে)